খেজুরে আলাপ

ছোটবেলায় ক্যাসেট প্লেয়ারে ভানু ব্যানার্জীর একটা কৌতুক প্রায়ই শুনতাম যেটা ছিল অনেকটা এরকম যে, ভানু তার গুরু বোনের অনুরোধে একবার এক সন্যাসীর সাথে দেখা করতে যায়। যেয়ে বলেন,

ভানুঃ মহারাজ, পেন্নাম হই
সাধূঃ পেন্নাম নয় কথাটা প্রনাম। একট "র"ফলা লাগবে।
ভানুঃ ভেম হইয়া গেছে মহারাজ।
সাধুঃ ভেম নয়, ভ্রম। এখানেও "র"ফলা লাগবে।
ভানুঃ পেত্তেক কথায় "র"ফলা লাগবে?
সাধুঃ পেত্তেক নয়, কথাটা প্রত্যেক, এখানেও "র"ফলা লাগবে।
ভানুঃ ব্রেশ ব্রেশ।
সাধুঃ এখানে আর "র"ফলা দিও না
ভানুঃ ন্রা, দ্রিমু য্রখন ত্রখন প্রত্যেক ক্রথাতেই দ্রিমু।

নামের বানান নিয়ে এতো আলোচনা হওয়ার পরও কেউ কেউ অবিশ্রান্তভাবে নামের বানান ভুলই লিখে যাচ্ছেন তখন মনে হচ্ছে ভানু ব্যানার্জীর মতো প্রত্যেক বার "র"ফলা দেয়ার (ভুল করার) শপথ নিয়ে ফেলেছেন মনে মনে, যার বলয় থেকে আর বের হয়ে আসতে পারছেন না।

আমাদের ছেলেবেলায় ঢাকায় এতো লোকজন ছিল না। তখন একটা রেওয়াজ ছিল ঢাকায় যারা থাকতেন তাদের বাসায় গ্রামের লোকজন বিপদে পড়লে, চিকিৎসার জন্য কিংবা ঢাকায় কোন কাজ পড়লে বা চিড়িয়াখানা, রমনা পার্ক দেখার উদ্দেশ্যে বিনা কোন সঙ্কোচে আশ্রয় নিতেন। অনেক সময় আশপাশের গ্রামের লোকজনও নিতেন। আমাদের যৌথ পরিবার থাকাতে আমরা আমাদের আশেপাশের অনেকগুলো গ্রাম কাভার করতাম। আমার দাদুর মামার বাড়ি থেকে আমার মামার বাড়ী আর সাথে আমার চাচী,ফুপ্পীরাতো ছিলেনই। অনেক ধরনের গ্রাম্য লোক এবং কালচার দেখার একটা বিরল সৌভাগ্য আমার ছোটবেলায় হয়েছিল, যা আমার পরে জন্মানো আমার ছোট বোনদেরই আর হয়নি। এরমধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য পার্ট ছিল কারো ছেলে / মেয়ে স্কুল ফাইন্যাল বা কলেজ ফাইন্যাল পরীক্ষায় ভালো রেজালট করলেই তাকে ঢাকায় এনে কোন ভালো কলেজে ভর্তি করা হতো। তখনকার দিনের ভালো কলেজ মানে জানতাম ছেলেদের জন্য "ঢাকা কলেজ" আর মেয়েদের জন্য "বদরুন্নেসা"। তখন হয়তো ঠিকমতো স্কুলেও যাই না কিন্তু বড়দের কথা থেকে এটুকু জানতাম যে এগুলো ভালো কলেজ।

অনেক ভালো কলেজের হোস্টেলে সবসময় সীট পাওয়া যেতো না বলে অনেক সময় দেখা যেতো অনেকে আমাদের বাসায় থেকে কলেজে পড়ছেন। এর আর একটা বড় কারণ হয়তো ছিল যে আমাদের বাসায় তখন সব সাইজের ছেলে-পুলে এভেলেভল ছিল। গ্রাম থেকে আগত প্রতিভাদের উদাহরন

দেখিয়ে দেখিয়ে (তাদের আড়ালে) অবশ্য আমাদের বাপ-চাচারা আমাদের কাকু, বড় ভাই-বোনদের তখন পড়ালেখার ব্যাপার নিয়ে কম হেনস্থা করতেন না। একটা কমন ব্যাপার ছিল তখন আমাদের বাসায় গ্রাম থেকে আগতদের চলন-বলন নিয়ে আমাদের বড়-ভাইবোনদের ঘরোয়া আলাপ আলোচনা। যা খুবই রসালো ছিল বিধায় আমরা সেখানটাতেই ঘুরঘুর করতাম সেগুলো শোনার আশায়। গ্রাম থেকে যখন প্রথম কেউ আসতো দেখা যেতো তেল জপজপে চুল, সাইডে বাকা সিথি, চকরা-বকরা শার্ট আর তার সাথে বেমানান শেপের কোন প্যান্ট পড়া। কিন্তু কলেজে ভর্তি হওয়ার তিন মাস না যেতেই চুলে তেল বন্ধ হয়ে মাঝখানে সিথি হতো সাথে ব্যকব্রাশ, বেমানান প্যান্টের শেপ ঘুরে জিনস এসে ঠেকতো আর সানগ্লাসতো মাস্ট ব্যাপার ছিল, একদম যাকে বলে অনেকটা নায়ক রাজ রাজ্জাক। দেখা যেতো বহুদিন ধরে ঢাকায় থাকা লোকদের পিছনে ফেলে নতুন গ্রাম থেকে আসা লোকেরা ফ্যাশন প্যারেডে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছেন। এদের মধ্যে যাদের পারিবারিক মূল্যবোধ এবং নিজের ব্যক্তিত্ব প্রবল থাকতো তারা শুধু পোষাকেই আধুনিকতা এনে সন্তুস্ট থাকতেন, বাকীরা আরো অনেক কায়দায় নিজেদের আধুনিক করে তুলতেন। অনেক সময় দেখা যেতো কায়দা রপ্ত করতে করতে যে কাজে এসেছিলেন তা ভন্ডুল করে বিদায় হয়েছেন। এর বিপরীতও থাকে কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই নগন্য।

আমার এই গল্প যদি শুধু সেকালেই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে বেচেই যেতাম। কিন্তু পোড়া কপাল তা একাল পর্যন্ত টেনে এনেছে। আজও এই বিদেশে নিজে ভাত খাই বেশ শখ করেই প্রায় প্রতিদিন এবং মেয়েকেও তাই খেতে দেই। যেদিন পাস্তা, বার্গার, পিজ্জা চাইনীজ হয় সেদিনকার মানে হোল সারাদিন দৌড়ের উপর ছিলাম তাই রান্নার সুযোগ হয়নি (বেশীর ভাগ সময়)। তবে এক আধ সময় শখ করে লাজানিয়া বা ম্যাকারনী করি না বললে ভুল বলা হবে কিন্তু আজও ভাতই বেশী পছন্দ করি। অনেকেই পার্টিতে বেশ গর্ব করে বলেন তারা বাংলাদেশী ষ্টাইলে আর খান না, ইউরোপীয়ান ষ্টাইলে খান কারণ বাচ্চারা খেতে চায় না, দুরকম রান্না আবার কে করবে। শাড়ি না পড়তে পড়তে শাড়ি পড়াই ভুলে গেছেন, বাসায় সারাক্ষন বিদেশী ভাষায় কথা বলেন তাই বাংলা ভুলেই যাচ্ছেন আরো কতো কি। মাঝে মাঝে ভাবি পচিশ বছর যে সংস্কৃতি লালন করেছে তা ভুলতে তাদের মাত্র পাচ বছর লাগে। ভোলাটাই বোধ হয় সহজ মনে রাখাটাই কঠিন। আর এর ফলাফল হলো, ঘরের প্রোডাক্ট এমন তৈরী হয় যারা ওয়েস্টান এক্সট্রীমদেরকেও হার মানিয়ে তৈরী হয় (বেশীরভাগ ক্ষেত্রে)। পশ্চিম আর পূর্বের অস্বাভাবিক কালচারের মিশ্রনে এমন অদ্ভুদ প্রোডাক্ট তৈরী হয় যে পড়ে বাবা-মায়েরাও তাদের ভয়ে সিটিয়ে থাকেন। নিজের সংস্কৃতি আর মূল্যবোধকে ছেড়ে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান হওয়ার এই হয় পরিনতি। এই বিদেশে এসেও যে ক্ষ্যাত ছিলাম সেই ক্ষ্যাতই রয়ে গেলাম। খাওয়া-দাওয়া থেকে পোষাক-পরিচ্ছদ মায় চিন্তা ভাবনায় পর্যন্ত। সেই জন্য কতো খোটাই না সইতে হয়। ইসলামিস্ট, ব্যকডেটেড, প্রাচীনপন্থী আরো কতো কি। কিন্তু অন্যদের পরিনতি দেখে ভাবি যা আছি ভালো আছি, আলটপ্পা আধুনিক হওয়ার দরকার নেই, পরে সামাল দেয়া কঠিন হবে। একটা কথা পড়েছিলাম কোথাও "Too much east is near to west." আজ মনে হয় অতি বেশী যান্ত্রিক জীবন, শিকড়বিহীন ভাবনা, মূল্যবোধ থেকে দূরে থাকা আপাত দৃষ্টিতে মনে হওয়া অত্যাধুনিক "হরে কৃষ- হরে রামা" জীবন পদ্ধতি আমাদেরকে অসভ্য আদিম যুগের দিকে যেনো অনেকটা ঠেলে দিচ্ছে। অনেক সময় খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় দেখা যায় দরিদ্র এক কিশোরী বা যুবতীর ছবি, অতি মলিন শত ছিন্ন কাপড়খানা প্রাণপনে সবার্ঙ্গে জড়িয়ে রেখে লজ্জা নিবারন করছে, সলজ্জ কুন্ঠিত তার দুচোখ, দারিদ্রতার অপরাধে যেনো। তার ঠিক ভিতরের পাতাতেই থাকে গর্বিত কোন অর্ধ উলংগ নারীর ছবি, নির্লজ্জ ভঙ্গিমায় নিজেকে প্রকাশ করার নগ্ন প্রয়াস।

একজনের ক্যাপশনে থাকে "দরিদ্র বাসন্তী" অন্যজনের ক্যাপশন হয় "রঙ্গিলা মধুবন্তী"। এই নির্লজ্জতা যদি সমর্থন করি তাহলে সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে কথা বলব কোন লজ্জায়? এই নির্লজ্জ নারীরা জেনে হোক আর না জেনেই হোক সামাজকে অবক্ষয়ের পথে টেনে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছেন। নির্লজ্জতা প্রচার আর সমর্থন করার পর কোন নারী কোথাও আক্রান্ত হলে অপর পক্ষ বলতেই পারে তোমার এই অর্ধ উলংগ বেশ, নির্লজ্জ আহ্বান কার জন্যে, কি জন্যে ছিল? আমার জন্যে নয় কিংবা এই জন্যেই নয় কি? খুব কি ভুল বলা হবে? ইচ্ছেমতো বন্ধনহীন অবাধ মেলামেশা আর বস্ত্রবিহীন জীবনযাপন যদি সভ্যতার মাপকাঠি হয় তাহলে ডিসকোভারী চ্যানেলে দেখানো দুর্গম আফ্রিকার উপজাতীয়রা সবচেয়ে সভ্য বলে স্বীকৃতি পাওয়া উচিৎ।

আগুনের আবিস্কারকে সভ্যতার দিকে মানষুয়ের অগ্রসর হওয়ার সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে ধরা হয়। তারপর ধীরে ধীরে কৃষিকাজ শুরু হয় যা থেকে পরিবারের সূচনা হয়। দলবদ্ধভাবে থাকা মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদেরকে প্রথমে গোষ্ঠীতে তারপরে পরিবারে ভাগ করল। প্রথমদিকে নিজেদের পরিবারের মধ্যেই মানুষের বিয়ে হতো কিন্তু আস্তে আস্তে সেটা বাইরে প্রসারিত হলো অর্থনীতি, জনবল ও ক্ষমতাকে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে। তারপর আস্তে আস্তে মানুষ সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে সমাজ-রাষ্ট্রের প্রচলন শুরু করে আজকের সভ্যতায় মানব সমাজ উন্নীত হয়েছে যা নিয়ে আজকের পৃথিবীর মানব সম্প্রদায় গর্বিত। সেই সুস্থ সমাজে আজ পুজিবাদের দোহাই দিয়ে অসুস্থতা তৈরী করার কোন অবকাশ নেই। আদিম মানুষেরা আস্তে আস্তে নিজেদেরকে সামাজিক জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর আমরা পুজিবাদের দোহাই দিয়ে কি আদিম সমাজে ফিরে যাওয়ার পথ করতে চাচ্ছি? আধুনিক সভ্যতা কি আমাদের অসভ্যতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে? আদিম মানুষতো বনে জঙ্গলে কাপড় ছাড়াই ঘুরতো, আস্তে আস্তে মানুষ সভ্য হওয়ার প্রক্রিয়ার সাথে সাথে লজ্জা কি বুঝতে শিখল, লজ্জা নিবারনের ব্যবস্থা নেয়ার চেস্টা করলো। সেই চেষ্টা থেকে আদিম মানুষ প্রথমবাস্থায় গাছের ছাল, বাকল পড়ে লজ্জা নিবারন করতো। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০০-৩২০০ সালে প্রথম লতাপাতা আর পশু পাখীর চামড়া আর পালক দিয়ে
মিশরীয়রা আর দক্ষিন এ্যামেরিকানরা পোষাকের সূচনা করেন, লজ্জা নিবারনের সাথে সাথে নিজেদের চামড়াকে আবহাওয়ার তীব্রতা থেকে রক্ষা করতে। তারপর মিশর,ব্যবিলন,মধ্যপ্রাচ্য,রোমান ও গ্রীকরা তন্তু দ্বারা তৈরী কাপড়ের ব্যবহার শুরু করল, প্রাথমিক উপাদান ছিল শুধু লিনেন, Linum Usistatissimum নামক গাছের আশ।। মধ্যযুগ থেকে বস্ত্রের আরো উন্নত বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটে ইউরোপে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সূতার আবিস্কার ও ব্যবহার বদলে দেয় পোষাক শিল্পের আমূল ইতিহাস। সেই থেকে আস্তে আস্তে পৃথিবী জুড়ে পোষাকের বিস্তার ঘটে। প্রথমদিকে বস্ত্রের প্রধান উপযোগ ছিল লজ্জা নিবারনের সাথে সাথে প্রচন্ড শীত বা গরম থেকে মানুষের চামড়াকে / শরীরকে রক্ষা করা। আজকের পোষাক শিল্প আর ফ্যাশন বহুদিনের বহুজনের নিরলস পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল। যুগে যুগে তার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনতো আছেই। পোষাক এখন শুধু আত্মরক্ষা আর লজ্জা নিবারনের হাতিয়ার না সাথে নিজেকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে তোলার প্রয়াসও। তার সাথে যুক্ত হয়েছে নানা রঙ্গের অলংকার। পোষাকে নিজেকে আবৃত করে, অলংকারে সজ্জিত করে আজকের মানুষ নিজেদেরকে আদিম যুগ থেকে আলাদা করে সভ্য হওয়ার দাবী করে। নিজেদের পূর্বপুরুষদের মেধা দিয়ে অর্জন করা এই অবদানকে আজ ভাসিয়ে দিতে হবে সোকলড আধুনিক হওয়ার জন্যে? এটাকি আসলে সোকলড আধুনিকতা নাকি প্রাচীন দিকে যাত্রা? যেখান থেকে শুরু সেখানেই শেষ আবার।

শিল্পের সংজ্ঞা কি কাউকে জিজ্ঞেস করলে এক কথায় তার জবাব দেয়া হয়তো কঠিন। তাছাড়া শিল্পের কোন সুনির্দিস্ট সংজ্ঞা আজোও তৈরীও হয়নি। তবে যে সংজ্ঞাটা মোটামুটি সর্বজন স্বীকৃত আর বহুল ব্যবহৃত সেটা হলো, "সত্য এবং সুন্দরের সমন্বয়কে শিল্প বলে"। সংজ্ঞানুযায়ী কোন কিছুকে শিল্প হতে গেলে দুটো জিনিসের উপস্থাপন ঘটাতে হবে। "সত্য এবং সুন্দর"। সত্যের কোন সংজ্ঞার দরকার নেই কিন্তু সুন্দর ব্যাপারটা আবার আপেক্ষিক। কোনটা সুন্দর আর কোনটা নয় সেটা নিয়ে বহু তর্ক বহু জনের দ্বারা বহুভাবে উপস্থাপন হয়েছে। তারপরই হয়তো সবর্সম্মত মতামত তৈরী হয়েছে যে, " Beauty lies in the eyes of the beholder." এ কথাটাকে একটু বিশ্লেষনে ফেললে দাড়াবে যার মন মানসিকতা যেভাবে যার রুচি তৈরী করেছে, সেভাবেই তার চোখ তৈরী হয়েছে অর্থ্যাৎ সেভাবেই সে কিছুকে সুন্দর বা অসুন্দর দেখবে। আমার কাছে যা স্বাভাবিক তাই সুন্দর। যা বাবা-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, বন্ধুর সাথে যা ভাগ করা যায়, একসাথে যে জিনিস সবাই মিলে উপভোগ করা যায়, সুস্থ সমাজ এবং পৃথিবী তৈরীর অঙ্গীকার যেখানে আছে তাই সুন্দর আর শিল্প। যার জন্য বয়স লাগে, ছেলে-মেয়ের কাছে লুকাতে হয়, বাবা-মাকে ফাকি দিতে হয় সেগুলো অসুন্দর আর অশিল্প। কর্মাশিয়াল ফ্লিমে বহু সুন্দর সুন্দর নায়িকার সুন্দর দেহের সুন্দর উপস্থাপনা থাকা সত্বেও এসব ফ্লিম কখনই জুরীদের দ্বারা পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয় না কারণ তাতে সত্য থাকে না বলে না তা শিল্প হয়ে উঠে না। যে শিল্পে সত্য অর্থ্যাৎ জীবন থাকে না তা কখনই সুন্দর হতে পারে না। যার দ্বারা সমাজে ক্ষয় আসবে, ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, যে জিনিস সমাজকে লুকিয়ে উপভোগ করতে হবে তা কি করে শিল্প হবে!?! কলার কোন একটা বিভাগকে জনগণের কাছে শিল্পের মর্যাদায় পৌছে দিতে গুনীজনদের কি প্রচন্ড পরিমান মেধা, মনন, পরিশ্রম, সৃজনশীল ভাবনা ব্যয় করতে হয় তারপর সেটা সাধারণের কাছে পৌছায়, কদর পায়। প্রাচীনকাল থেকে মুনী, ঋষি, ওস্তাদদের আপ্রাণ চেষ্টায় নৃত্যকলা, সংগীতকলা, অভিনয়কলা আজ শিল্প হয়ে উঠেছে। শিল্পের পূজারীরা শিল্পী হিসেবে স্কীকৃত হন। একজন নৃত্যশিল্পী নিজেকে তৈরী করতে ঘন্টার পর ঘন্টা প্রতিদিন সময় ব্যয় করেন এবং তা করেন বছরের পর বছর, সমানভাবে কন্ঠশিল্পী, অভিনেত্রী, লেখক সবাইকেই নিজেকে তৈরী করতে আজীবন সাধনা করতে হয়। তারপর তারা তাদের কর্মকান্ড সাধারণের কাছে উপস্থিত করেন, যোগ্য হলে স্বীকৃতি পান আর নইলে বিদায় ঘন্টা বেজে যায়। সেই আজীবন সাধনা করা শিল্পীর সাথে কোন একজন কোথাও দাড়িয়ে জামা কাপড় খুললেই সমান শিল্পীর মর্যাদা পাবে? দুজনই শিল্পী? একজনতো দিনরাত এক করেছে সাধনায় আর একজন কি করেছে? আর যার মস্তিস্ক এই ধারণাকে সমর্থন করে করুক আমার করেনা। তাহলে শুধু পর্নো নয় আমার মতে খুন, বোমাবাজী সবই শিল্প হওয়ার দাবী রাখে, এবং তাতে অংশ নেয়া সবাই বড় শিল্পী। জৈবিক প্রেষনা প্রত্যেক প্রাণীর সাধারণ ধর্ম সত্যি কিন্তু মানুষের আছে তার সাথে সামাজিক প্রেষনা, কারণ একমাত্র মানুষই নিজের তৈরী করা সমাজে বসবাস করে।

কেউ একজন অবিরাম বলে চলছেন এই পুজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় কেউ যদি তার নিজের দেহের নগ্ন প্রদর্শনের মাধ্যমে টাকা কামিয়ে নিতে পারে তাহলে সেটা কেনো খারাপ হবে? যিনি একটি স্বাধীন দেশে যেয়ে বোমা ফেলার প্রস্তাব দেন তার কাছে এ ধরনের কথাই আশা করা যায় বটে। এ্যামেরিকান প্রেসিডেন্টের মতো মুখে মানবতার বানী আবার অন্য দেশে গুচ্ছ বোমার সাপ্লাই। মানবতার আড়ালে দানবতা। তাহলে এই পুজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় আফগানিস্থান যদি তাদের ইচ্ছে মতো হেরোইন চাষ করে তাহলে এ্যামেরিকা কে বাধা দেবার? তারা কেনো প্রতিবছর টার্গেট ঠিক করে দিবেন কতোটুকু হেরোইন চাষ হবে আফগানিস্থানে? নিজেরাতো তারা পরিবেশ বিষয়ের কোন বিলে সাইন করে না

তাদের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে। তাদের কল-কারখানার রাসায়নিক ধোয়ায় পৃথিবী বিষাক, পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বারবার সতর্ক করুক কিন্তু তাদের তা নিয়ে মাথাব্যাথা নেই, অন্যের ব্যাপারে তারাই আসেন টার্গেট নিয়ে। ড্রাগসের বাজারতো অনেক বড় আর বাধা নিষেধ না থাকলে রমরমা হয়ে আরো বেড়েই যাবে, এটাকে বাধা দেয়া কি পুজিবাদের ধারণাকে সমর্থন করছে? আবার কেউ যদি নিজের মেধা-বুদ্ধি খাটিয়ে অন্যজনকে খুন করে তাতে অন্যদের বলার কি আছে? এটাওতো পুজিবাদে এক নতুন ধরনের ব্যবসা এবং বেশ ভালো ব্যবসায়ই বটে। মাফিয়া ডনরাতো এই পেশায় মিলিয়নিয়ার হয়ে গেছেন। ছোটবেলায় সমাজবিজ্ঞান বই যা পড়েছিলাম মনে হচ্ছে সেগুলোকে এখন পুজিবাদের আওতায় নতুন করে লিখতে হবে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, মূল্যবোধ, এগুলোর আর প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে না আধুনিক পুজিবাদী সমাজে। এখানে চলবে "যেমন খুশী তেমন সাজো" এর মতো যেভাবে পারো টাকা আয় করো বাকি সব যাক গোল্লায়। শিকড়বিহীন সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাতে হবে। আর বয়সের দোহাই এর কোন প্রশ্ন এখানে আসে না, কারণ কেস স্টাডিতে কোথাওই প্রমান হয়নি আজ অব্দি যে প্রাপ্ত বয়স্করা ভুল করেন না বা ভুল পথে অগ্রসর হন না, শুধু অপ্রাপ্ত বয়স্করাই ভুল করে। প্রাপ্রবয়স্ক বলতে যদি আঠারোর উর্ধ্বে বোঝানো হয়। বরং উলটোটাই বেশী দেখা যায়। ড্রাগ এডিক্ট, রেপিস্ট এরা বেশীর ভাগ সময়ই প্রাপ্ত বয়স্ক থাকেন এবং নিজেরা জেনে শুনেই বিষ পান করেন সাথে নিজের পরিবার এবং সমাজকেও জোর করে করান। অনেকটা গোপাল ভাড়ের গল্পের মতো একটার সাথে আরেকটা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

ছেলে পেয়াজ- রসুন খায়?
যেদিন এদিক সেদিক যায় সেদিন খায়।
এদিক সেদিক কোন দিন যায়?
যেদিন এটা ওটা খায়।

"একজন নারী বা পুরুষ যতটাই দেহ, ততটাই মন। দেহ ব্যতীত স্বাধীন মনের অস্তিত্ব এখনো প্রমানিত নয়'। যদি এটাকে আক্ষরিক অর্থ ধরে কেউ লিখে থাকেন তাহলে তাকে বলতে হয় একে ব্যাকরণে ফেললে কি দাড়ায় ??? একজন অতিকায় বিশাল দেহী গালিভার সাইজের লোকের খুব বড় একটা মন আর উদার চিন্তা ভাবনা থাকবে? বিচার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ হবে? আর লিলিপুট সাইজ লোকদের ঠিক তার বিপরীত? যতটা দেহ = ততটা মন? দেহকে আধার করে মন আর দেহস্বর্বস মনের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে। কাজেও আছে কথায় ও আছে। সেটা বোঝার মতো অনুভূতি অবশ্য হয়তো সবার নেই। আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েরাই বিবাহিত ধর্ষনের স্বীকার-সেটা নারীর অবমাননা নয়। এটা অবশ্যই নারীর অবমাননা। তো এই অবমাননার শোধ মেয়েরা কি করে তুলবে? কাপড় জামা খুলে, কিছু অসুস্থ মানসিকতার, বিকৃত রুচির পুরুষদের তাদের অবসর সময়ে এন্টারটেন করে? তাদের নোংরা চাহিদার যোগানদার হয়ে? একজনের দ্বারা অপমানিত হয়ে প্রতিশোধ নেবে অনেকের নোংরা দৃষ্টি দিয়ে অপমানিত হয়ে? কি ভালো বুদ্ধি। খেলেও লাভ, ফেললেও লাভ। অন্যপুরুষকে সে নিজের দেহ না দেখালে, পিতৃতন্ত্রের হাজার হাজার বছরের এই জগদ্দল পাথর ভাংবে কি করে? পুরুষেরা কি হাজার হাজার বছর ধরে দেহ দেখিয়ে এই সমাজে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন? নাকি বিদ্যা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে করেছেন? যে যোগ্যতা দিয়ে পুরুষরা কর্তৃত্ব করেছেন মেয়েরাও সেই যোগ্যতা দিয়েই করছে। সেনাবাহিনী, পাইলট, বিজ্ঞানী, সেবা কোন পেশায় নেই আজ মেয়েরা? পৃথিবীর বহু জায়গায়ই আজ

মেয়েরা কর্তৃত্ব করছেন এবং বেশ দোর্দন্ড প্রতাপেই করছেন এবং দেহ দেখিয়ে মনোরঞ্জন করা ছাড়াই করছেন। ইতিহাসে জায়গা করে নেয়া ফ্লোরেনস নাইটিংগেল, মহাশ্বেতা দেবী, রাজিয়া সুলতানা, চাদ সুলতানা, ইরিনা কুরী, ইন্দিরা গান্ধী, শাবানা আজমী, শেখ হাসিনা, কল্পনা চাওলা, মাদার তেরেসা, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, রানী ভিক্টোরিয়া, রানী এলিজাবেথ, মীরা নায়ার, কল্পনা লাজমী, সামিয়া জামান সবাই নিজ নিজ গুনে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত, দেহ দেখিয়ে নয়। পর্নোগ্রাফীর প্রসারন শুধু সমাজের এদিক ওদিকের অন্ধকারকেই বাড়াবে, অস্থিতিশীল পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র তৈরী করবে। পর্নো দিয়ে আরম্ভ হবে তারপর আসবে ড্রাগস, রেপ আর তার সবর্শেষ পরিনতি হলো এইডসের রোগী হয়ে ভবলীলা সাঙ্গ। যে প্রতিশ্রুতিশীল তরুন সমাজ পৃথিবীকে অনেক কিছু দিতে পারে তারা নীল কোন অন্ধকারে হারিয়ে যাক, অসুস্থ হোক আমরা অবশ্যই তা চাই না। আজকের এই সভ্য সমাজ ব্যবস্থা নিজেদের এবং তার অনাগত পরিবারকে নিরাপদ করতে তৈরী করেছে সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, শিল্প। এগুলোর সুস্থ বিকাশই আমাদের কাম্য, এটম বোমার মতো প্রযুক্তির ভুল অথবা অপব্যবহার করে মানব সভ্যতার আজকের এই অর্জনকে নষ্ট করা হবে কলঙ্কজনক।

ই-ফোরামের কিছু সর্ব বিদ্যা বিশারদরা ইন্টারনেটে রিসার্চ করার বদৌলতে (আমরা সাধারণ জনগণরা সার্চ করি, উনারা রিসার্চ করেন) যখন অনেক কিছুর পক্ষে ও বিপক্ষে বিরাট ফর্দ দাড় করিয়ে দেন, পুরো ফর্দ পড়ে হাসবো না কাদবো বুঝতে পারি না। প্রযুক্তি জীবনকে কতোই সহজ করে তুলেছে। গুগল আর ইয়াহু'র কল্যানে কোন একটা বিষয় কিংবা ওয়ার্ড ধরে সার্চ দিলে তার আদি- অন্ত- বৃত্তান্ত সব হাজির হয় আজকাল তার জন্য আর আমাদের সেকেলেদের মতো পড়াশোনা করার দরকার হয় না। লেখক হওয়াও কতো সোজা আজকাল। কাট আর পেষ্ট এর মাধ্যমে দাড়িয়ে গেলো পাচ পৃষ্ঠার আর্টিকেল। কিন্তু তার সারগর্ভ কি সেটা সেটা অবশ্য ভিন্ন কথা। কেউ কেউ আছেন যে জানেন না এমন কোন বিষয় নেই, সে মা দিবসই হোক, গৌতম বুদ্ধের জন্মদিনই হোক আর ডাচ ইমিগ্রেশন ল'ই হোক সব ব্যাপারেই সমান জ্ঞান তাদের। সবকিছুই নিয়েই বেশ চট চট একটা লেখা তৈরী করে ফেলতে পারেন। বেশ কিছুদিন আগে ই-ফোরামেই এমন একটি আর্টিকেল পড়েছিলাম ডাচ ইমিগ্রেশন আইনের উপর। আর্টিকেল পড়ে নিজেকে চিমটি কাটতে হয়েছিল ডাচল্যান্ডেই থাকিতো??? দশ বছর ডাচল্যান্ডে থেকে কোনদিন রাস্তাঘাটে কাউকে বিদেশী হওয়ার অপরাধে গালি দিতেও শুনিনি কাউকে গালি খেতেও শুনিনি। ট্র্যামে, বাসে, সুপারমার্কেট কোথাওই নয়। বরং বহু কাজে ডাচদের সাদর এবং সানন্দ সহযোগিতা পেয়েছি, ভদ্র বলে এই জাতির বিশ্বজোড়া সুনাম আছে, যে সুনাম ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান বা ইটালীয়ানদের নেই। একজন বিদেশী যিনি একবর্ণও ডাচ জানেন না কি করে বুঝলেন গালাগালি দেয়া হচ্ছে কাউকে? তারা নিশ্চয়ই ইংরেজী কিংবা বাংলায়-হিন্দীতে গালি দেন নি। প্রথম প্রথম যখন ডাচ জানতাম না তখন সুপার মার্কেটে বাজার করতে গেলে অনেক অপরিচিত বয়স্ক ভদ্রমহিলারা প্রচুর সময় ব্যয় করে সঠিক জিনিসটি খুজে দিতে সাহায্য করেছেন, জিপিআরএস সিস্টেম চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত কোথাও যেতে পথভুলো আমি পথ হারিয়ে ফেললে রাস্তায় যাকেই পথের হদিস জিজ্ঞেস করেছি, নিজের বহু সময় ব্যয় দিয়েই তারা ডিরেকশন দিয়েছেন। এমন ঘটনাও ঘটেছে রাত অনেক হয়ে গেছে বলে আমার সামনে ডাচ ভদ্রলোক নিজে নিজের গাড়ি ড্রাইভ করেছেন আর আমি পিছনে তাকে ফলো করে যেয়ে গন্তব্যে পৌছেছি, যাকে বলে পৌছে দিয়েছেন। নাইন-ইলাভেন এর পরে যখন এ দেশের তরুন সমাজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ তখন অফিসে কলিগরা ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চেয়েছেন সেসব টেলিভিশন টক শো এর উগ্র বক্তব্যের জন্য। ডাচল্যান্ড সবচেয়ে বেশী যারা আছেন ইমিগ্র্যান্ট তারা হলেন টার্কী,

দ্বিতীয় স্থানে মরোক্কান, তৃতীয় সুরিনামী, চতুর্থ সোমালিয়ান আর পঞ্চম গতানুগতিক চায়নীজ। পাকিস্থানী ইমিগ্র্যান্টদের সিরিয়াল বহু পিছনে। এর আগে আছে আফগানিস্থান, ভেঙ্গে যাওয়া রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপীয়ান, মিশরীয় আর আফ্রিকানরা। বরং ব্যাংলোরের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রীর কল্যানে ইন্ডিয়ান ইমিগ্র্যান্টের সংখ্যা পাকিস্থানীদের থেকে বহুগুন বেশী। তবে হ্যা টার্কী, আফগানি না পাকিস্থানী সেটা হয়তো সিউর হওয়া কঠিন শুধু চেহারা দেখে কারণ বাকী সবতো বোরখার অন্তরালে। সুতরাং পাকিস্থানী ইমিগ্র্যান্ট বেশী এ তথ্য ডাহা ভুল। তারজন্য অবশ্য কাউকে দোষ দিচ্ছি না, কারণ পাচ / ছ দিন কোথাও কোর্স করতে এসেই কোন একটা দেশের জনগণ, তাদের দৈনন্দিন চলাফেরা, তাদের বিদেশী নীতি নিয়ে আর্টিকেল লিখে ফেলা একটি অসম্ভব ও অবাস্তব ব্যাপার। আর এ অসম্ভব ব্যাপার ঘটাতে গেলে ডাহা ডাহা ভুল হওয়াই অনেক বেশী স্বাভাবিক। দশ বছরের ইউরোপীয়ান জীবনে মোটামুটি ইউরোপের অধিকাংশ দেশই ঘোরা হয়েছে, কোথাও কোথাও তিন / চারবারও গেছি, দশদিন-বারোদিন থেকেছি, সুপারমার্কেটে যেয়ে বাজার করেছি কিন্তু সেই শুধু সেই দেখা থেকে আর্টিকেল লিখে ফেলার দুঃসাহস কখনও করিনি। শুধু কোথাও পাচ দিন থাকাই লেখালেখির জন্য হয়তো যথেষ্ঠ নয় এ চিন্তা থেকে। যৌক্তিক অনুমান গবেষনার প্রথম শর্ত কিন্তু অযৌক্তিক অনুমান বা কল্পনা হলো ধর্মগ্রন্থের মতো কল্পকাহিনী যা বিপদজ্জনক।

"তুরস্কের মুসলমানদের সাথে কারো সংঘাত হয়েছে বলে জানা নেই, কারণ তুরস্কের মেয়েরা বিচে বিকিনি পড়ে ঘুরে" লিখেছেন তিনি। তাহলে বলতে হয় জানার পরিধি খুবই ছোট কারণ চিন্তা-ভাবনা সব শুধু হয়তো বিকিনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষের মুসলমানরাও খুব প্রগতিশীল কারণ সেখানেও মুসলমান মেয়েরা বিকিনি পড়ে বিচে ঘুরে, যেনো বিকিনি হলো প্রগতিশীলতার ধারক ও বাহক। কিন্তু কতো পার্সেন্ট মুসলমান মেয়ে কিংবা ভারতীয় অন্যধর্মালম্বী মেয়ে বিকিনি পড়ে ভারতের বিচে ঘুরে বেড়ায়? মোট জনসংখ্যার শতকরা কতো ভাগ তারা? কিংবা ইজিপ্টের কতো ভাগ মেয়ে তা করে? সিনেমা দিয়ে আর বিকিনি দিয়ে কোন জাতীর মূল চরিত্র বিচার করা হাস্যকর এবং উদ্ভটও বটে। আজ প্রায় দশ বছর ধরে তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য পদ চাইছে কিন্তু পাচ্ছে না, স্যাঙ্গুয়ীন কান্ট্রির সুবিধা চাইছে পাচ্ছে না তার প্রধান উল্লেখযোগ্য কারণ তাদের উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনা এবং ইউরোপীয় জীবন যাত্রার সাথে এডজাস্ট করার প্রতি সীমাহীন অনিহা এবং ইউরোপীয়ানদের প্রতি অত্যন্ত অপমানজনক আচরন। ইউরোপে থেকে ইউরোপীয়ানদের সাথে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করার হিম্মত একমাত্র মুসলমানদেরই আছে তারমধ্যে টার্কিসরা উল্লেখযোগ্য। কথায় কথায় রেসিজিজমের কথা তুলে, ইউরোপীয়ানদের বেকায়দায় ফেলে দিয়ে লুটেপুটে খাচ্ছে তারা ইউরোপকে। এখন ডাচেরা আইন পাশ করেছে নেদারল্যান্ডসে কাউকে রেসিডেনস ভিসা দেয়ার আগে, নিজ দেশ থেকে ডাচ শিখে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে আসতে হবে নইলে রেসিডেনস ভিসা ইস্যু করে না। আর আগে নেদারল্যান্ডস এসে ডাচ শিখতে লোকে স্কুলে যেতো, তাও যাদের কাজ ছিল না কিংবা যাদের আয় কম তারা যেতেন ফ্রী। এই ফ্রীর সুবিধা দেয়া সত্বেও বহু বিদেশী আছেন যারা বিশ বছর নেদারল্যান্ডসে আছেন কিন্তু একবর্ণ ডাচ বলতেও পারেন না, বুঝতেও পারেন না। তাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ হলো টার্কী, মরোক্কান, চায়নীজ। এদের বেশীর ভাগ ইংরেজীও জানেন না। এরা ডাক্তারের কাছে গেলে কিংবা হসপিটালে ইমার্জেনসী হলে দেখা যায় দোভাষী নিয়ে যায়। বাচ্চাদের স্কুলে প্যারেন্টস ডে তে টিচাররা কি বলেন তাও বুঝতে পারেন না, টিভিতে জরুরী ঘোষনা দেয়া হলেও তারা জানেনা বোমা পড়েছে না ভূমিকম্প। সেজন্য আজকের এই কঠোর মনোভাব ডাচ সরকারের। বিকিনি পড়ে যারা ঘুরে তারা হয়তো ডাচল্যান্ডে

বসবাসকারী শ্রমিক ক্যাটাগরীর কোন টার্কীকে বিয়ে করে না, কারণ রাস্তায় বেরোলেই দেখা যায় আপাদমস্তক ঢেকে টার্কীস মহিলারা পথ চলছেন, হালাল মিটের খোজ করছেন। আমি যখন ডাচ শিখতাম আমার সাথে এক টার্কীস মেয়ে এক ক্লাসে পড়তো যে আমাদের ডাচ টিচারকে শুয়োর খেতে নিষেধ করেছিলো কারণ তা হারাম!!! টার্কীস মহিলাদেরকে ডাচ শিখতে না দেয়ার কিংবা ডাচ সমাজে মিশতে না দেয়ার অনেক কারণ আছে। এখানে গৃহীনিদের জন্য আলাদা ভাতার ব্যবস্থা আছে, তাছাড়া বাচ্চাদের জন্য সরকার যে খরচের পয়সা দেন তা নিয়মনুযায়ী মায়ের হিসাবে আসার কথা। এগুলো থেকে অনেক টার্কী স্বামীই তার স্ত্রীকে বঞ্চিত রাখতে চান। নিজেরা সে পয়সা আত্মসাত করে নিজেদের ইচ্ছেনুযায়ী খরচ করেন। স্ত্রীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলে স্বামীদের যথেচ্ছ ব্যবহার মেনে নিবে না বিধায় স্বামীরা তথা পুরুষরা শোষন করার জন্য ডাচ ভাষা তথা সমাজ থেকে স্ত্রীদেরকে দূরে রাখতে চান। আগে কেউ যদি একবার রেসিডেনস ভিসা নিয়ে নেদারল্যান্ডসে আসত, আসার দু সপ্তাহের পরও যদি স্বামী স্ত্রীর বনিবনা না হওয়ার কারণে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতো, তার নেদারল্যান্ডসে থাকার ভিসার কোন সমস্যা হতো না। দেখা যায় টার্কী বাবারা জোর করে মেয়েকে বা ছেলেকে টার্কী নিয়ে বিয়ে দিয়ে আসেন তাদের পছন্দের ছেলে-মেয়ের সাথে কিংবা তাদের পরিবারের কারো সাথে। তারপর ভিসা পেয়ে মেয়ের জামাই যখন আসলো হল্যান্ডে এসে দেখলো বউ হয়তো লুকিয়ে কোন ডাচ ছেলের সাথে প্রেম করছে কিংবা জীনস টি শার্ট পড়ে ঘুরে বেরাচ্ছে ব্যাস হয়ে গেলো দুমাদুম গোটা দুচার। বউ পিটানোর জন্য মুসলমানরা ইউরোপে খুব নাম করেছে। এর জন্য আগে হল্যান্ড পুলিশের একটা স্পেশাল হেল্প লাইন ছিল, মেয়েদের গায়ে হাত তুললে সরাসরি ওই নাম্বারে ফোন করে হেল্প নেয়া যেতো । তারপর পুলিশ, জেলখানা। কিন্তু আগে এরপরও সেই ব্যক্তি হল্যান্ডে থাকতে পারত, এখন পত্রপাঠ ফেরত পাঠানো হয় দেশে। এ সমস্যা মেয়েদের জামাইদের নিয়েই বেশী হয় কারণ মুসলমান ছেলেরা ইউরোপে এসে ইসলাম ধর্মের অপমান সহ্য করতে পারেন না। ছেলের বউদের নিয়ে এ সমস্যা কম হয় কারণ মেয়েরা দুনিয়াদারী বুঝে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে দেখা যায় তিন বাচ্চার মা হয়ে গেছে। তারপর দেখা যায় ভাষা জানে না, কারো সাথে মিশতে পারে না বিধায় নিজের অধিকার নিয়ে কথা বলার মতো ফ্লোর তৈরী করতে পারে না। বেশীর ভাগ টার্কী যারা ইউরপোপে বসবাস করে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল থেকে আসা, অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন এবং সীমাহীন দরিদ্রতো বটেই। একদম আমাদের বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া থেকে যারা শ্রমিক খাটতে এতদূর আসেন ঠিক তাদের মতোই। বিকিনি পড়া যেসব টার্কিস মেয়েদের ছবি টেলিভিশনে বা ম্যাগাজিনের কভার পেজ এ থাকে তারা খুব কম ই হল্যান্ড বা জার্মানে থাকেন। তুরস্কতে বসবাস করা তুর্কীরা এখন অনেক মর্ডান দেন এই হল্যান্ড, জার্মানী থাকা তুর্কীদের থেকে। দক্ষিন আফ্রিকা, দক্ষিন এ্যামেরিকায় থাকা ইন্ডিয়ানদের মতো যে যুগে তারা মাতৃভূমিকে ফেলে এসেছিলেন এখনও সে যুগেই তারা মাতৃভূমিকে কল্পনা করেন। টার্কীদের সাথে কারো সংঘাত হয়েছে কিনা (ধর্মীয় দৃষ্টিকোন) থেকে জানা নেই লিখেছেন বলেই লিখছি জেনে রাখুন ডাচ আর ডয়েচ (জার্মান) রা টার্কীদের কে মনে প্রাণে ঘৃনা করে। তারজন্য অবশ্যই টার্কীরা দায়ী। মুসলমান হিসেবে তাদের অহংকার এবং ইউরোপীয়ান সমাজ, জীবনরীতির প্রতি সীমাহীন অশ্রদ্ধা আজকে তাদেরকে এ অবস্থায় নিয়ে এসেছে। টার্কীদেরকে হেয় করে বিভিন্ন কৌতুক, ছড়া পুরো ডাচ তথা ইউরোপীয়ান সমাজে প্রচলিত, মাঝে মাঝে টিভি নাটকেও এসব হাস্যরসের দৃশ্য দেখা যায় এবং কিছুটা নেতিবাচক ভাবেই দেখানো হয়।

এককোটি পনর লক্ষ জনগণের দেশ নেদারল্যান্ডস যার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী হলো ইমিগ্র্যান্ট মানে আমরা ইমিগ্র্যান্ট ডাচ। আর বাকী অর্ধকোটিও পিওর ডাচ না। সেগুলোও বেশীর ভাগই জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইন্দোনেশিয়ান, আরুবা, কুরাসাও এর বলাড মিশ্রিত ডাচ। শুধুই ডাচ ব্লাড দিয়ে তৈরী ডাচ হয়তো পচিশ লক্ষও নেই এদেশে। এদেশের রানী বিয়ে করেছেন জার্মান, ক্রাউন প্রিন্স বিয়ে করেছেন আর্জেন্টিনিয়ানকে। অন্যান্য রাজকন্যা ও রাজপুত্ররাও সুইডিশ, জার্মান, বেলজিয়ান বিয়ে করেছেন। তারপরও অপবাদ যে মালিটকালচার নেই এখানে??? ইংল্যান্ডের রাজ পরিবারের মতো এদেশের রাজপরিবার এখানের জনগণের কাছে অজনপ্রিয় নয় মোটেই। রাজপরিবার খুব একটা রয়ালিটি মেনে চলেন না। সাধারণের সাথে তাদের উঠাবসা। রানী প্রায়ই তার গার্ডদের ফাকি দিয়ে জিনস পড়ে সাইকেল চালাতে চলে যান লোকালয়ে। ভুল পার্কিং কিংবা ট্র্যাফিক আইন অমান্যের দায়ে তারাও জরিমানা দেন। আমরা শুধু জরিমানা দিয়ে পার পাই আর তাদেরকে প্রকাশ্যে আদালতে এবং জনগণের কাছে ক্ষমাও চাইতে হয় এজন্য। বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় ও উন্নত জীবনযাত্রার দেশের তালিকা যখনই কোন জানার্লে প্রকাশ হয় প্রথম পাচে নেদারল্যান্ডসের নাম থাকে সবসময়। যখন ইউরো ছিল না তখন কোথাও মানি এক্সচেঞ্জ রেট দেখানোর সময় ডলার, পাউন্ড, মার্ক এর পরেই থাকতো বেশীর ভাগ সময় ডাচ গিলডারের নাম। এদের অর্থনীতি ছোট কি করে হয়? ছোট একটি দেশ এই পৃথিবীর মানচিত্রে যাদের অবস্থান খুজে পাওয়া দায়, যাদের প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কিছুই নেই, শুধুমাত্র মেধা আর প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাথা উচু করে বিশ্বে দাড়িয়ে আছে সমস্ত পরাশক্তির সাথে পাল্লা দিয়ে তারা "ছোট"!!! বোকা ছাড়া আর কেউ বলবে না। ফ্রান্স, জার্মান, ইংল্যান্ডের মতো প্রতিবেশীদের পিছনে ফেলে দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে চলা একটি দেশের সমন্ধে এগুলো বলাতো রীতিমতো অপরাধ। ইউরোপীও ইউনিয়নের স্থায়ী সদস্য প্লাস এর অন্যতম জন্মদাতা ও পালনকর্তা দেশ, আন্তর্জাতিক আদালতের অবস্থান নেদারল্যান্ডসে, এতো কিছুর পরও এরা একটু আধটু নয় বেশ গরীব হলো কি করে? ইতালী, লন্ডন, বার্লিন কিংবা পার্ট ওফ প্যারিস কখনও ঘুরে গেলে জানবেন গরীব নেদারল্যান্ডসতো কিছুতেই নয়। জীবনযাত্রার মান ডাচদের থেকে ওদিকে অনেক নীচে। আর এ্যামেরিকাকেতো এর মধ্যে টানলামই না। ১৪ই আগস্টের দৈনিক ইত্তেফাকের বিশ্ব সংবাদে দেখলাম বিবিসির উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা গরীব দেশদেরকে উন্নয়ন সাহায্য দিতে ধনী দেশদের মধ্যে এক নম্বরে আছে নেদারল্যান্ডস, বৃটেন আছে বারো নম্বরে আর জাপান আছে চৌদ্দ নম্বরে। সবোর্চ্চ সাহায্যদেয় দরিদ্র দেশকে এমন চৌদ্দটি দেশের তালিকা করা হয়েছে। গ্রীন হাউস কমানো আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং গরীব দেশের মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করেছে বিশ্বজুড়ে নেদারল্যান্ডস। এ্যামেরিকা যে সাহায্য দিয়েছে তা শুধু তাদের অর্থনীতিকে রক্ষা করতে ভর্তুকী আর মার্কিন পন্য কেনার ঋণ হিসেবে। মানে কৈ এর তেল দিয়ে কৈ ভাজা হয়েছে। তবে হ্যা ডাচেরা ভীষন কিপ্টে হয়, কিপ্টেমির জন্য তাদের দুনিয়া জোড়া নাম আছে। পৃথিবীর সেরা কিপ্টেদের লিষ্ট তৈরী করা হলে ক্যালকেসিয়ানদের পরেই ডাচদের নাম আসবে।

ডাচেরা প্রথম প্রস্টিটিউশনকে লিগালাইজ করেছে পুরো পৃথিবীতে। এদেশে বাক স্বাধীনতার চরম প্রকাশ্য রুপ হলো মরোক্কান কিশোরের হাতে চিত্র পরিচালক ভ্যান গগের মৃত্যু। এ দেশের দ্বিতীয় স্থানে আছে মুসলমান জনসংখ্যা এবং বোরখা ও হিজাব পড়া নারী। স্কুল কলেজে অফিসে হিজাব পড়া মেয়ের সংখ্যা নিতান্ত কম না। এখানের স্কুলে কলেজে তা নিয়ে কোন নেতিবাচক আলোচনা এখন হয়নি। পর্নোগ্রাফীর সমঝদার না হলে ডাচ ভিসা পাওয়া যাবে না এমন কথা ডাচ ইমিগ্রেশন আইনের কোথাও

অর্ন্তভুক্ত হয়েছে কিনা তার খোজ এখনও পাইনি। আর চারশো ডলারের কথাতো যারা রেসিডেনস ভিসা বা স্টুডেন্ট ভিসায় এসেছে তারাও জানে না। তিনি কোথা থেকে জানলেন, সেটা খুবই গবেষনার বিষয়। ভারডঙ্কের সাথে গোপন কোন আলোচনা উনার হয়ে থাকলে সেটা অবশ্য আমাদের সাধারণের জানার কথাও নয়। তবে ডাচ ভাষা শিখতে এ্যাম্বেসীতে পয়সা দিয়ে ভর্তি হতে হয় এবং এ্যাম্বেসী কর্তৃক মনোনীত ও পরিচালিত স্কুলে পড়ে এবং পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে নেদারল্যান্ডসে আসার ভিসা কালেক্ট করতে হয়। আসার পর ডাচ গর্ভমেন্ট ভাষা শিক্ষার খরচের আংশিক অবশ্য ফেরৎ দেন, এখনও পর্যন্ত এইটুকু ডাচবাসীরা জানেন। তার সাথে চারশো ডলারের কোন সর্ম্পক নেই। ভাষা শিক্ষার সে খরচ চারশ ডলারের বহু গুন বেশী। চারশো ডলার দিয়ে ভিসা ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য ডাচ এম্বেসী থেকে ভিডিও কালেক্ট হয়তো শুধু যারা পাচ দিনের জন্য কোর্স করতে আসেন তাদের জন্য, পর্নোগ্রাফীর প্রতি তাদের কারো কারো স্পেশাল টানের কারণেই হয়তো বা।

ইউরোপ থেকে বিতারিত জনগন দিয়ে এ্যামেরিকা তৈরী, পয়সায় আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ এ্যামেরিকানরা তাদের এক সময়ের রাজা, সভ্যতার জন্ম এবং পালনকর্তা ইউরোপীয়ানদের সভ্যতা ভব্যতা শিখাতে আসলে কিছু বলার নেই। যদিও ইউরোপে আছি জীবিকার জন্য, আশাকরি কাজ শেষ হলেই দেশে ফিরে যাব, সমস্ত ভালোবাসা হৃদয়-মন পড়ে থাকে দেশের জন্য, তাই ইউরোপ, নেদারল্যান্ডস কিংবা এ্যামেরিকা দিয়ে কিছুই যায় আসে না। এই খেজুরে আলাপ করার কোন দরকার ছিল না কিন্তু দেখতে পেলাম মিথ্যে অভিযোগ করা হয়েছে, বিভিন্ন ফোরামে আমি কোন ই-ম্যাগাজিন এর সোকলড মর্ডান রুপের নাকি সমালোচনা করেছি, যা সর্ম্পূন ভুল। এই স্বাধীন পৃথিবীতে পুজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় কেউ যদি এটাকে পেশা হিসেবে নিয়ে লাখ লাখ টাকা বানিয়ে নেন আমার কোন আপত্তি নেই তাতে। প্রত্যেকের জীবন তার রুচি, শিক্ষা, আদর্শ, মূল্যেবোধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এবং হবে। কথা প্রসঙ্গে যদি কোথাও কিছু লিখে থাকি সেটা শধু মাত্রই রেফারেনস হিসেবে, ব্যক্তিগত কোন কারণ নেই সেখানে। ইতিহাসের কথা, বাস্তব ঘটনা কিছু উল্লেখ করলাম মিথ্যাচার বা ভুল তথ্য পরিবেশনের প্রতিবাদ হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ নেয়াকে দেখা হয় আওয়ামী লীগার হিসেবে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র মানে বোঝানো হয় ধর্মভ্রষ্ট হওয়া বা নাস্তিকতা, যুগ যুগ ধরে চলে আসা অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে বলা হয় ইনকিলাবী। আর কিছুলোক যারা ধর্মহীন, বিভেদহীন যৌক্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখি, তাদেরকে ন্যুডিষ্ট, পর্নোলাভার, পার্ভাট ভাবানোর একটা অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন কিছু মুখোশধারী সোকলড উদারপন্থীরা। উদারতা মানেই উছৃংখলতা বা স্বেচ্ছাচারিতা নয়। একটা বিভেদহীন যৌক্তিক সমাজে ন্যুডিটির স্থান কোথায়? যা কিছু অসুন্দর, যা কিছু অস্বাভাবিক, যা জীবনের কথা বলে না, যা দ্বারা পৃথিবীর মানব সমাজের কোন কল্যান হয় না বলে মনে করি, আমি তার সমস্ত কিছুর বিপক্ষে। সে হতে পারে পর্নোগ্রাগী, ড্রাগস নেয়া, ধর্মীয় উন্মাদনা, সমকামীতা, গর্ভপাত সমস্ত কিছুই। তার জন্য যদি আমাকে ইসলামিস্ট কিংবা প্রাচীনপন্থী, ব্যকডেটেড জাতীয় আখ্যা পেতে হয় তাতে আমার বলার কিছু নেই। রবি ঠাকুরতো জানতেন যে এদিন আসবে একদিন পৃথিবীতে তাই তিনি বলে গেছেন, "যদি ডাক শুনে তোর কেউ নাইই আসে তবে একলা চলোরে"। আত্মদম্ভতার চোটেতো অনেকেই দল ছেড়ে দে ছুট করেছেন তাই একলা চলার অভ্যাস করাই অনেকের জন্য ভালো।

তানবীরা তালুকদার
২১।০৮।০৬